★ রাষ্ট্রভাষা নির্দ্ধারণ সমস্যা প্রসঙ্গে ★

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা সমস্যার পর্য্যালোচনা

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করে নেওয়ার সমর্থনে ভাষা কমিশনের চূড়ান্ত রায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে জনসাধারণের এক বিরাট অংশ মোটেই খুসী হতে পারেন নি বরং তার প্রতিবাদই জানিয়েছেন। কংগ্রেসের উচ্চমহলে ভাষা কমিশনের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট অভিনন্দিত হলেও কিছু কিছু ঝানু কংগ্রেসী নেতাও একে বিরোধীতা না করে পারেন নি। রাজাগোপালআচারী থেকে শুরু করে সুনীতি চ্যাটার্জী পর্য্যন্ত এবং বিভিন্ন সাহিত্যিক, সাংবাদিক তথা চিন্তাশীল সম্প্রদায় উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কাগজে পত্রে আলোচ্য বিষয় নিয়ে প্রচুর সোরগোল হচ্ছে সন্দেহ নেই।

একটু পুঙ্খাপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে যে উপরোক্ত বিরোধীতা সত্বেও এই সব আপাত বিরোধী প্রস্তাবগুলির বেশীরভাগের মধ্যেই একটা মৌলিক ঐক্য বিদ্যমান। ভাষা কমিশনের সিদ্ধান্তের যাঁরা বিরোধীতা করেছেন তাদের মধ্যে কারোও কারোও বক্তব্য হচ্ছে যে হিন্দী চালু কর তাতে আপত্তি নেই কিন্তু তাড়া হুড়ো করে নয়, ধীরে ধীরে অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে হিন্দী প্রবর্ত্তন করতে হবে যাতে সমস্ত ভারতীয় ভাষাগুলি সম্মিলিত ভাবে ইংরেজীর অভাবকে পূরণ করতে পারে। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষের বক্তব্যের মূল সুর এটাই। অপর আর এক দলের বক্তব্য হচ্ছে যে কোন না কোন ভারতীয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে—তবে সেটা হিন্দী নয়। আর যে কদিন পর্য্যন্ত সেই রাষ্ট্রভাষা চূড়ান্ত ভাবে স্থিরীকৃত না হচ্ছে ততদিন ইংরেজী তার কাজ চালাতে থাকুক।

এখন দেখা যাক ভাষা কমিশন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার স্বপক্ষে কি কি যুক্তি দিয়েছেন। প্রথম যুক্তি হচ্ছে কোন ভারতীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা দরকার, না হলে নাকি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্ব নষ্ট হবে। দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে হিন্দী ভাষা ভারতবাসীর বেশীর ভাগ জনসাধারণের ভাষা। তৃতীয়, হিন্দী ভাষার উন্নতির প্রয়োজনীয়তা।

ভাষা কমিশন এবং বিরোধীদের বিরাট এক অংশের মধ্যে একটা ঐক্যের মূল সুর ফুটে উঠেছে, তাহচ্ছে কোন না কোন ভারতীয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা দরকার। তা না হলে নাকি স্বাধীনতা সার্ব্বভৌমত্ব সব কিছুই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা মনে করি এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে অবৈজ্ঞানিক! '৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে মেহনতী জনতার সত্যিকারের স্বাধীনতা ও মুক্তি না আসলেও ভারতের ধনিক শ্রেণীর অর্থে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, সেই স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্ব কোন্ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হচ্ছে না হচ্ছে তার ওপর মোটেই নির্ভরশীল নয়। তা যদি হ'ত তাহলে যে আমেরিকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজী ভাষায় ভাবের আদান প্রদান করছে, যাদের সকলেই ইংরেজীতে কথা বলে, তাদের পক্ষে গ্রেটবৃটেনের ওপর কোনরূপ অধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হোত না। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় আজ আমেরিকাই সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং গ্রেটবৃটেন অনেক দিক থেকেই আমেরিকার মুখাপেক্ষী। মনে রাখা দরকার যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জগতে অনেক কিছুই আছে যা শুধুমাত্র বিদেশী একথা বলে বর্জন করা মোটেই উচিত নয় এবং তা কেউ বর্জন করেও না। বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারই কোন বিশেষ দেশের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, বিদেশের আবিষ্কার হলেও তাকে অন্যান্য সকল দেশই সাদরে গ্রহণ করে থাকে। জাতীয়তা ও জাতীয়

(৮-এর পাতায় দেখুন)

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী এম, এল, এ
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র

১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা] ১৭ই ডিসেম্বর '৫৭ [২ আনা ঃ ১২ নয়া পয়সা

সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ

রাণাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৭ই, ৮ই, ৯ই ডিসেম্বর সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের ৪র্থ সম্মেলন রাণাঘাট, কুপার্স ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের কার্য্য পরিচালনা করেন শ্রীজীবনলাল চ্যাটার্জী, শ্রীহেমন্ত কুমার বসু, এম, এল, এ, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমোহিত মৈত্র, শ্রীজীতেশ লাহিড়ীকে লইয়া গঠিত সভাপতি মণ্ডলী। সম্মেলনে পঃ বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে আগত পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি এবং বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য হইতে আগত বাস্তুহারা ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধিগণও অংশ গ্রহণ করেন।

৯ই ডিসেম্বর সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের ৪র্থ সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে বিশ হাজার বাস্তুহারা অংশ গ্রহণ করেন।

সম্প্রতি দার্জিলিং-এ অনুষ্ঠিত পুনর্বাসন মন্ত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তুহারা পুনর্বাসনের দায়িত্ব অস্বীকার করার চক্রান্ত, নবাগত বাস্তুহারাদের আগমন বন্ধের জন্য তিসা বন্ধ করার অভিসন্ধি ও পঃ বঙ্গে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের সমস্ত রকমের সুযোগ ও সম্ভাবনা কার্য্যকরী করার প্রচেষ্টা না করিয়াই বাস্তুহারাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কোন সুষ্ঠু ও বাস্তব পরিকল্পনা ছাড়াই বাস্তুহারাদের লইয়া ছিনিমিনি খেলার কংগ্রেসী সরকারের দীর্ঘ দিনের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ জমিয়া উঠিয়াছে তাহারই বহিঃপ্রকাশ হইয়াছে ইউ, সি, আর, সির ৪র্থ সম্মেলনের এই জমায়েতের মধ্যে।

সম্মেলনে ৮ দফা দাবী সম্বলিত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলনে পঃ বঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও গণ-সংগঠনের তরফে বর্ত্তমান অবস্থায় বাস্তুহারাদের সংগ্রামকে ব্যাপকতর করিয়া দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইয়া শ্রীজীবনলাল চ্যাটার্জী, শ্রীহেমন্ত কুমার বসু, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীনীহার মুখার্জী, শ্রীমতী সুধা রায়, শ্রীবিমলানন্দ মুখার্জী, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার, শ্রীহৃষিকেশ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন।

শ্রীহেমন্ত কুমার বসু, এম, এল, এ-কে সভাপতি ও শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্ত্তীকে সাধারণ সম্পাদক করিয়া পঞ্চাশ জনের একটি শক্তিশালী কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

সম্পাদকীয়

জনসাধারণ ও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীদের প্রতি

বিরোধী দলের নেতার বেতন বৃদ্ধির যে প্রস্তাবকে জ্যোতিবাবু ও কমিউনিষ্ট পার্টি এতদিন ধরিয়া সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন, যাহাকে একমাত্র এস, ইউ, সি প্রতিনিধি প্রথম হইতেই নীতির ভিত্তিতে তীব্র বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন তাহার পিছনে ব্যাপক জনসমর্থন সৃষ্টি হওয়ায় গত ১৬ই ডিসেম্বর জ্যোতিবাবু শেষ পর্য্যন্ত সেই সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। এস, ইউ, সির সঠিক নীতির পিছনে জনসাধারণ যে সমর্থন ও আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহার জন্য জনসাধারণকে বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাইতেছি। আর কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীদের কাছে আমাদের বক্তব্য, যে দলের প্রতি অন্ধতা ও গোঁড়ামীকে আশ্রয় করিয়া "স্বাধীনতা"র পাতায় "চিঠিপত্র" "সম্পাদকীয়" ও অন্যান্য স্তম্ভে এস, ইউ, সি সম্পর্কে মিথ্যাচার ও রুচি বিগর্হিত মন্তব্যের মধ্য দিয়া যে হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন সে পথ পরিত্যাগ করাই ইতিহাসের সঠিক নির্দ্দেশ। কষ্টসাধ্য হইলেও সঠিক শ্রমিক শ্রেণীর দল এস, ইউ, সি'কে শক্তিশালী করাই প্রতিটি সাচ্চা কমিউনিষ্টের একমাত্র কাজ।

বিধানবাবু বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতার বেতন ধার্য্য করার প্রস্তাব আনার আগে গত একুশে নভেম্বর এক সর্ব্বদলীয় বৈঠক ডেকে-ছিলেন আলোচনার জন্য। উদ্দেশ্য মহৎ—বিরোধী দলের নেতাকে বেতন দিয়ে পুরস্কৃত ক'রে আইনকানুনের বেড়াজালে বিরোধী মনোভাবকে আটকে ফেলা, জনসাধারণের সামনে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী মহান আদর্শকে তুলে ধরা।

সেই ফাঁদে শেষ পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি পা দিলোই, কিন্তু তার আগে বাইশে নভেম্বর থেকে চৌঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় একপক্ষকাল ধরে "যুগান্তর" আর "স্বাধীনতা"র পাতায় পাতায় যে খণ্ড যুদ্ধ চললো তার একটা শেষ উত্তর দেওয়া উচিৎ বলে আমরা মনে করি। এপ্রসঙ্গ যদিও কম্যুনিষ্ট পার্টির 'বেতন গ্রহন' এর পরেই শেষ করা উচিৎ ছিল ব'লে অনেকেই মনে করবেন, তবুও ঐ একপক্ষকাল ব্যাপী খণ্ডযুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টির যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তা বহুলাংশে জনতাকে বিভ্রান্ত করার মতো বলেই আজ আবার এই পুরোনো প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে।

প্রশ্নটা উঠেছিলো যুগান্তরের বাইশে নভেম্বরের পাতায় প্রকাশিত এক সংবাদকে ভিত্তি করে। যুগান্তরপ্রকাশিত সংবাদ—'কমিউনিষ্ট পার্টি নাকি বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবকে সমর্থন করিয়াছে'—এর প্রতিবাদ করে জ্যোতিবাবু বিবৃতি দিলেন যে সংবাদটি 'অসত্য' ও 'দুরভিসন্ধিমূলক' —সত্যটা যে কি জ্যোতিবাবু বল্লেননা। সুবোধ ব্যানার্জী এবং যতীন চক্রবর্ত্তী তার উত্তরে বল্লেন—সংবাদ সত্য। জ্যোতিবাবু সুর পাল্টে প্রতিবাদ করলেন—সংবাদ বিভ্রান্তিকর। সুবোধ বাবু পাল্টা প্রশ্ন করলেন, সত্য সংবাদটা প্রকাশ করতে জ্যোতিবাবু কুণ্ঠিত কেন? জ্যোতিবাবু বললেন, সত্য প্রকাশ করে সুবোধ বাবু আর যতীন বাবুর আচার পদ্ধতির মান (Public standard of behaviour) লঙ্ঘন করেছেন। প্রত্যুত্তরে সুবোধবাবু লিখলেন—জনসাধারণের কাছে সত্য ঘটনা জানানোই সাচ্চা কমিউনিষ্টদের আচার পদ্ধতি সম্মত কাজ। জনস্বার্থ রক্ষাই কমিউনিষ্টদের আচার পদ্ধতির মান রক্ষার একমাত্র মাপকাঠি। উত্তরে "স্বাধীনতা" লিখলো কংগ্রেস সরকার আজ আইনগত ভাবে বিরোধীদের মর্য্যাদা দিতে এগিয়ে এসেছে, আমরা মর্য্যাদা নিতে ছাড়বো কেন?

এইখানে এসেই 'যুগান্তর' আর 'স্বাধীনতার' লেখনি যুদ্ধ শেষ হ'লো কিন্তু এইখানে আমাদের প্রশ্ন রয়ে গেলো দুটো; প্রথমতঃ আচারপদ্ধতির মান আমাদের কিসের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের দেওয়া কোনও মর্য্যাদা কি সত্যিই আমাদের পক্ষে মর্য্যাদা?

পুঁজিবাদী সমাজে প্রচলিত আচার পদ্ধতির মান আর কমিউনিষ্টদের আচার পদ্ধতির মান এক নয়, কখনো এক হ'তে পারে না। শোষক শ্রেণীর শিক্ষা, দীক্ষা, রীতিনীতি আচার ব্যবহার গড়ে ওঠে একটা বিশেষ সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে একটা বিশেষ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করে, যার সাথে শোষিত জনসাধারণের অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোনও সম্পর্ক তো নেইই, বরং তা সম্পূর্ণ বিরোধী। সত্যিকারের কমিউ-নিষ্টের যে কোনও কাজ বা যে কোনও কথাই শোষিত জনসাধারণের স্বার্থের বাইরে এক পাও যেতে পারে না, বিরুদ্ধে তো নয়ই। এ অবস্থায় কেউ যদি কমিউনিষ্ট তকমা এঁটেও আচার পদ্ধতির মানের দোহাই দিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে কোনও ঘটনার সত্যতা গোপন করতে চায়, তাতে এই টুকুই প্রমাণ হয় যে তকমা আঁটা কম্যুনিষ্টটি আসলে কমিউনিষ্ট মুখোসের আড়ালে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই শোষক শ্রেণীর হাতকেই শক্তিশালী করছেন।

মার্ক্সবাদের এ শিক্ষা যে কম্যুনিষ্ট পার্টি জানেন না তা নয়—তবে বইয়ে পড়া সে জ্ঞান সত্যিকারের কম্যুনিষ্ট চরিত্র না থাকার ফলে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুলিয়ে যায়। তাই তো দেখতে পাই যে, যে কম্যুনিষ্ট পার্টি গত ২০শে নভেম্বর এর 'স্বাধীনতা'র আমাদের (বিভিন্ন বাম পন্থী দলগুলিকে) কিছু কিছু গালা-গালি দিয়ে সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলেন: **"আমরা আরো জানাইয়া দিতে চাই যে কমিউনিষ্টরা তাহাদের কথা ও কাজ কখনও জনসাধা-রণের চক্ষুর অন্তরালে গোপন করিয়া রাখেনা"** সেই কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা জ্যোতিবাবু, সুবোধ-বাবুর "বৈঠকে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার সত্য বিবরণ জনস্বার্থে প্রকাশ্যে প্রকাশ করাকে যদি জ্যোতিবাবু আচার পদ্ধতির নিয়ম লঙ্ঘন মনে করেন তাহা হইলে আমি নাচার," —এই বক্তব্যের উত্তরে বলেন **'আমি এমন কি জনসাধারণের খাতিরেও তাহাদের সৌজন্য বিধি লঙ্ঘন করিতে পারিনা।"** অর্থাৎ জনস্বার্থ জাহান্নামে গেলেও তিনি গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন। জ্যোতিবাবু যে নিজে "স্বাধীনতার" উপরোক্ত বক্তব্যকে বিরোধীতা করেছেন সে দোষ তাঁর নিজের নয়—নিজেকে এবং তার পার্টিকে ভুলভাবে কমিউনিষ্ট বলে ঠাওর করাতেই যত গণ্ডগোল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে "মর্য্যাদার" প্রশ্ন। আমরা মনে করি যে সত্যি-কারের কমিউনিষ্টের কাছে কমিউনিষ্ট হবার মত মর্য্যাদা ও গৌরব দুনিয়ায় আর কিছুতেই নেই। দুনিয়ায় যদি কোন সত্যিকারের উচ্চ আদর্শ থেকে থাকে—যা সত্যি সত্যিই গৌরবের বিষয়—তা হচ্ছে নিজেকে কম্যুনিষ্ট হিসেবে গড়ে তোলা ও সারা জীবন দিয়ে তার সত্যতা প্রমাণ করতে পারা। একজন সত্যিকারের কমিউনিষ্ট এই আদর্শকেই উঁচু করে ধরেন এবং জনতাকেও সেই শিক্ষাই দেন। তাই শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে সরকার পক্ষ বিরোধী দলের নেতাকে (এ ক্ষেত্রে জ্যোতি বসুকে) আইন-গত স্বীকৃতি দিলে তা প্রত্যাখ্যান করার প্রশ্ন না উঠলেও এই স্বীকৃতি দানে কোন নূতন মর্য্যাদার প্রশ্ন ওঠে না। জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত বামপন্থী প্রতিনিধিদের কাছে জন-সাধারণের দেওয়া মর্য্যাদাই আসল মর্য্যাদা হওয়া উচিৎ—সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত তথাকথিত মর্য্যাদা নয়। আর যদি কোন বামপন্থী বা কম্যুনিষ্ট নাম নিয়ে চলা নেতার কাছে "সরকারী মর্য্যাদাকে" সত্যিকারের মর্য্যাদা বলে প্রতীয়মান হয়—যদি তিনি একে গৌরবের বিষয় বলে মনে করেন, তাহলে সেই নেতার পক্ষে কংগ্রেসী কুশাসন, দুর্নীতি ও জন-স্বার্থবিরোধী চরিত্র সম্পর্কে বাগাড়ম্বর করা নেহাৎই স্ববিরোধীতার পরিচায়ক নয় কি? যে রাষ্ট্র ও সরকারী ব্যবস্থা জনস্বার্থবিরোধী—তার দেওয়া অধিকারকে সত্যিকার মর্য্যাদা বোধে গৌরব অনুভব করলে—সেই ব্যবস্থার উৎখাতের কথা কোন্ মুখে উচ্চারণ করা সম্ভব, তা আমরা জানি না। আর একটি কথা; সত্যিকারের মর্য্যাদা কেউ কাউকে দিতে পারে না—ওটা অর্জন করতে হয়। যে সত্যিকারের মর্য্যাদা পাবার যোগ্য—এ বোধও তার থাকে।

পরিশেষে একটি কথাই বলবো যে কম্যুনিষ্ট পার্টি চাপে পড়ে টাকার অঙ্ক কমাবার প্রস্তাব পেশ করলেও "নীতির দিক থেকে" সরকারী প্রস্তাবকে মেনে নিলে বিধান রায় জনতার সামনে বিরোধী দলকে যেভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চক্রান্ত করেছিলেন—সেটাই জয়যুক্ত হবে এবং গোটা দেশে সংস্কারবাদী আবহাওয়ার প্রভাব আরোও বিস্তার করতে এবং সমাজতন্ত্রের কবর খুঁড়তেই সাহায্য করা হবে।

বারোটি সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক শ্রেণীর দলের যুক্ত বিবৃতির সমালোচনা

গত ১৪ই নভেম্বর হইতে ১৬ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ১২টি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রমিক দলের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পরে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং শান্তি ও সমাজতন্ত্রের লড়াইএর ধারা সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। এই বিবৃতিতে বলা হয় যে, যে সমস্ত শ্রমিক দলগুলি এই বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা নিজেরাই এই বিবৃতির ব্যক্ত মতামতগুলি বিচার বিবেচনা করিবেন এবং নিজেদের নীতি ও কর্মসূচী নির্দ্ধারণ করিবেন। সুতরাং একথা পরিষ্কার যে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের বিপ্লবের কার্য্যক্রম ও কৌশল কি হইবে তাহা স্থির করার মূল দায়িত্ব সেই সেই দেশের শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলির। আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত হইতে সেই সব দলগুলির শিক্ষা লইতে হয়, একথা সত্য—তবে সেই শিক্ষার বাস্তব ও সঠিক প্রয়োগের দায়িত্ব আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের উপর কখনও ন্যস্ত থাকিতে পারে না।

এই বিবৃতিতে প্রতিটি দেশের শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলির শিক্ষা করিবার মত কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান নির্দ্দেশ স্থান পাইয়াছে। সেই নির্দ্দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছে — সংশোধনবাদ (revisionism) সম্পর্কে হুঁসিয়ারী। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, "গোঁড়ামিকে (Dogmatism) নিন্দা করার সাথে সাথে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি মনে করে যে বর্তমান অবস্থায় সবচেয়ে বড় শত্রু হইতেছে সংশোধনবাদ (Revisionism)।" বিবৃতিতে আরোও বলা হইয়াছে "আধুনিক সংশোধনবাদ, মার্কসবাদ—লেনিনবাদকে মসীলিপ্ত করার চেষ্টা করিতেছে, প্রাচীন পন্থী ও বর্তমান সমাজপ্রগতির ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মার্কসবাদকে আখ্যা দেওয়া হইতেছে। মার্কসবাদের বিপ্লবী ভাবধারাকে ধ্বংস করার ও শ্রমিক শ্রেণীর মন হইতে সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট করার প্রচেষ্টা হইতেছে। সংশোধনবাদীরা সর্বহারা বিপ্লবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকে এবং ধনতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে পৌঁছাইবার পথে **সর্বহারা একনায়কত্বের** ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। তাঁহারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করেন। এবং **সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার** নীতিও বিসর্জন দেন। সাথে সাথে পার্টি সংগঠনের লেনিনবাদী নীতিগুলি ও সর্ব্বোপরি **গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের** প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর দলকে বিপ্লবী সংগঠন হিসাবে গড়িয়া তোলার পরিবর্ত্তে একটি তার্কিক সভায় (Debating Society) পরিণত করিতে চাহেন।" আলোচ্য ঘোষণার উপরোক্ত এই বক্তব্যটি অত্যন্ত মূল্যবান ও সময়োচিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। কেননা গোঁড়ামিকে দূর করার নামে একই যান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে মার্কসবাদের মূল নীতিগুলিকে অস্বীকার করার ঝোঁক এবং সম্ভাবনা আমাদের নজরে পড়িয়াছে। সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের বিবৃতির মধ্যেই যে এই দুর্ব্বলতা স্থান পাইয়াছিল সেকথা আমরা পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছি। ১৯৫৬ সালের মে মাসে এস, ইউ, সির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত "Statement on the twentieth congress of the C.P.S.U"তে বলা হয় "……ইহা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে এবং সংস্কারবাদী চিন্তাধারাকে আরও বেশী রসদ জোগাইয়াছে। বিংশতিতম কংগ্রেস উপলক্ষে বিভিন্ন কমিউনিষ্ট পার্টির বিবৃতিতে সংস্কারবাদী চিন্তার ছাপ দেখা যাইতেছে। সমাজতন্ত্রে পৌঁছিবার প্রধান এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় পথ **সর্ব্বহারার একনায়কত্ব** প্রতিষ্ঠার এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার কাজকে তারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও কয়েকটি তথাকথিত মার্কসবাদী দল নীরবে কবর দিয়াছেন।…… বহুদিন যাবৎ ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির চিন্তায় ও কর্মপদ্ধতিতে বিপ্লবী মার্কসবাদ লেনিনবাদের পরিবর্তে ফিলিষ্টাইন্ বুর্জোয়া উদারতা স্থান পাইয়াছে। পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে পৌঁছিবার যে ব্যাখ্যা বিংশতিতম কংগ্রেসে দেওয়া হয়, তার ফলে উক্ত সংস্কারবাদী চিন্তা আরও সবলতা লাভ করিয়াছে। আমরা মনে করি ঐ ব্যাখ্যা অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।" (পৃষ্ঠা ২৬)

পরবর্ত্তী সময়ে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে ঘোষিত বিবৃতিতে এই সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে হুঁসিয়ারীকে আমরা স্বাগত জানাইয়াছি। ("গণদাবী" দ্রষ্টব্য) আলোচ্য বিবৃতিতেও সেই ভুলের স্বীকৃতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত না হইয়া পারি নাই। এই বিবৃতি এস,ইউ,সির বিশ্লেষণের নির্ভুলতা আর একবার প্রমাণ করিল।

বারোটি কম্যুনিষ্ট পার্টির আলোচ্য ঘোষণার দ্বিতীয় শিক্ষা হইতেছে, বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশগুলি সম্পর্কে মার্কসবাদের মূলনীতিগুলির পুর্ণঘোষণা। তাঁহারা বলেন "সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা এই মার্কসীয়-লেনিনীয় সূত্রের নির্ভুলতা প্রমাণিত করিয়াছে যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রক্রিয়া ও সমাজতন্ত্র গড়িয়া তোলার প্রক্রিয়া কতকগুলি **মৌলিক বিধানের** দ্বারা পরিচালিত। **সমাজতন্ত্রের পথের অনুসরণকারী সকল দেশের ক্ষেত্রেই এই মৌলিক বিধানগুলি প্রযোজ্য।** বহুবিধ ঐতিহাসিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের পাশাপাশি এই বিধানগুলি সর্ব্বত্রই প্রকটিত হয়।" সেই মূলনীতিগুলি কি কি সে সম্পর্কে বলা হয় "শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক একটি বিশেষ পদ্ধতিতে **সর্ব্বহারা বিপ্লব** সংগঠিত করা এবং বিশেষ ধরণের **সর্ব্বহারা একনায়কত্ব** প্রতিষ্ঠিত করা।" সেই মৌলিক বিধানগুলি কি কি? বর্তমান অবস্থায় পুঁজিবাদ হইতে সমাজতন্ত্রে পৌঁছাইবার একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পথ কি?

"সে পথ সশস্ত্র বিপ্লবের পথ, পুঁজিপতি শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করে পুরাতন শোষণমূলক রাষ্ট্রের পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণীর নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ, সর্ব্বহারার একনায়কত্ব কায়েম করার পথ। দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত সমাজতন্ত্রে পৌঁছোবার একমাত্র পথ থাকবে এই অক্টোবর বিপ্লবের পথ, এই পথকে অস্বীকার করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছান সম্ভব নয়। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও আভ্যন্তরীণ শ্রেণী সমাবেশের তারতম্যের জন্য বিপ্লবের রূপ ভিন্ন হতে পারে, কোথাও তা রাশিয়ার মত স্বল্পকালব্যাপী কোথাও বা চীনের মত দীর্ঘকাল ধরে পরিচালিত হতে পারে। কোথাও রাশিয়ার মত গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পথ কেটে এগুতে হবে, কোথাও চীনের ন্যায় ক্ষমতা দখলের পরে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লবের অগ্রগতি চলতে থাকবে। কিন্তু বিপ্লবের রূপের এই পার্থক্য সত্বেও **সর্ব্বত্র সশস্ত্র বিপ্লব ঘটবেই।** সেই রকম সর্ব্বত্র সর্ব্বহারার একনায়কত্বও হুবহু একরূপ ধারণ করবে না; তবুও বিভিন্ন দেশের নিজস্ব বৈশিষ্টজনিত সর্ব্বহারার একনায়কত্বের রূপের পার্থক্য ঘটলেও তা **সর্ব্বহারার একনায়কত্বই হবে।**"

(গণদাবী, ৯ই নভেম্বর '৫৭)

প্রকৃতপক্ষে মার্ক্সবাদের এই মূলনীতিগুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকিলে সংশোধনবাদকে দূর করা সম্ভব নয়।

কেননা "মার্ক্সবাদ Dogma নয়"—একথা বলিয়া এবং পরিবর্ত্তিত অবস্থায় মার্ক্সবাদের পরিবর্ত্তিত প্রয়োগের উপর বেশী জোর দিতে গিয়া এমনকি মার্ক্সবাদের মূল নীতিগুলি বিসর্জন দেওয়ার পথ বাহিয়াই সংশোধনবাদ তার শক্তি সঞ্চয় করে। অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুযায়ী মার্ক্সবাদের যথাযথ প্রয়োগের শিক্ষা মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানেরই অন্তর্গত। কিন্তু তাই

(৬-এর পাতায় দেখুন)

কংগ্রেসী উদ্বাস্তু নীতি উদ্বাস্তুদের ধ্বংস করার নীতি

জঙ্গী গণআন্দোলন ছাড়া সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান অসম্ভব

গত ১৪ই নভেম্বর সাড়ম্বরে "চাচা নেহেরু"র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর ছবি সহ প্রকাশিত হয়েছে প্রভাতী সংবাদপত্রগুলি আর একই সাথে এই দিনের কাগজে ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লোকসভায় পূর্ব্ববঙ্গ উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক (?) বিবৃতি। মিথ্যাচার এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা মানুষকে কোথায় ঠেলে নিয়ে যেতে পারে—তার চরম নিদর্শন এই বিবৃতিটী। এই বিবৃতিতে নেহেরুজী ঘোষণা করেছেন, "সরকার অথবা জাতীয় নেতৃবৃন্দ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পাকিস্তানের সমস্ত সংখ্যালঘুর দায়িত্ব গ্রহণ করিবার আশ্বাস দিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।" এই সুদীর্ঘ বিবৃতিতে আরও বহু বাগাড়ম্বর এবং দার্জ্জিলিংএ পুনর্ব্বাসন সচিব সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার পক্ষে বহু ওকালতীর পর সরকারী বক্তব্য তিনি সাফ কথায় বলে দিয়েছেন, "তাহারা (পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু—সঃ গঃ) ভারতে চলিয়া আসিয়া বসবাস করিতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে ভবিষ্যতে পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে যখনই যে কেহ যে কোন সময়ের জন্য আসুক, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকার তাহাদের দায়িত্ব লইবেন, এই প্রকার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতে পারি কিনা। আমরা কখনও এই প্রকার প্রতিশ্রুতি দিই নাই এবং কিভাবে দেওয়া যাইতে পারে, তাহাও আমি ভাবিয়া পাই না।"

প্রথমেই পণ্ডিত নেহেরুর বক্তব্যের সত্যতাকে একটু যাচাই করে দেখা যাক। দেশ বিভাগের পূর্ব্বে গান্ধীজী সর্দ্দার প্যাটেল থেকে সুরু করে অন্যান্য ছোট বড় কংগ্রেসী নেতারা পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেছিলেন। একথা আজ প্রধান মন্ত্রী নেহেরু ভুলে যেতে পারেন কিন্তু সেদিনের ঘটনাবলীর কথা যাদের স্মরণ আছে তাঁরা ভোলেন নি। আজ নেহেরু ভুলে যেতে পারেন সেদিনকার তাঁর বক্তব্য, "সীমান্তের অপর পারে আমাদের যে আত্মীয়েরা রহিয়াছে, তাহারা অবহেলিত কিংবা তাহাদিগকে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, এই কথা যেন তাহাদের মনে না আসে। আমরা তাহাদের কল্যাণের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিব।"

অবশ্য আমরা জানি যে, শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার তাগিদে নেহেরুজী এমন অনেক ভাল ভাল কথা বলেন কিন্তু প্রয়োজনের সময় সুবিধামত তা ভুলতেও অসুবিধা হয় না। স্বাধীনতার পবিত্র আকাঙ্ক্ষাকে আপোষের চোরাবালীর মধ্য দিয়ে বেইমানী করার জন্য একথা বলা সেদিন প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু এই সমস্ত প্রতিশ্রুতির আজ আর কোন মূল্যই নেই।

পণ্ডিত নেহেরুর এই বক্তব্যকে ঠিক ঠিক মত অনুধাবন করতে হলে আমাদের একটু পেছনের দিকে নজর দিতে হবে। পাঠকদের বোধ হয় স্মরণ আছে যে পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার বিগত অধিবেশনে কংগ্রেসী মহল থেকে "বর্ডার সিল" করার এক বে-সরকারী "পরামর্শ" এসেছিল—যাতে পূর্ব্ববঙ্গ থেকে আর একটি পরিবারও ভারতে না আসতে পারেন। কিন্তু সে সময় সমস্ত বিরোধী সদস্য এক যোগে তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করেছিলেন এবং বাইরে থেকেও জনসাধারণ ধীক্কার দিয়েছিলেন এই প্রস্তাবকে—যার ফলে প্রস্তাব তখন কার্য্যকরী করা যায় নি। কিন্তু হাওড়ায় অনুষ্ঠিত পঃ বঙ্গের বিধানমণ্ডলী ও লোকসভার কংগ্রেসী সদস্যদের সম্মেলনে এই একই সুরে আলোচনা হয়। এই সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেন, "যাহারা পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে চলিয়া আসিতে চাহে, তাহারা ও অন্যান্য দেশ হইতে জীবিকার সন্ধানে ভারতে আগমনেচ্ছু ব্যক্তিদের মতই আসিতে পারে"—অর্থাৎ আসতে পারো কিন্তু দায়িত্ব আমাদের নেই। এই বক্তব্যকেই আইনের প্রলেপ দেওয়ার জন্য দার্জিলিংএ অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব্বাঞ্চলিক পুনর্ব্বাসন সচিব সম্মেলন গত অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে। পুনর্ব্বাসন মন্ত্রনালয়ের সেক্রেটারী শ্রীধর্ম্মবীরের সভাপতিত্বে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'টি। প্রথমতঃ নূতন উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ, দ্বিতীয়তঃ যারা এসেছেন, তাদেরও যাতে বাংলার বাইরে পাঠান যায়—তার বন্দোবস্ত করা। এই সম্মেলনেই স্থির হয় যে, পঃ বঙ্গের শিবিরগুলি থেকে ১৫ হাজার উদ্বাস্তুকে উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং উড়িষ্যায় নূতন শিবিরে পাঠানো হবে। বাকী উদ্বাস্তুদের পাঠান হবে উড়িষ্যার চরবেতিয়া, মালকানগিরি ও কালাহান্দি জেলায়, উত্তর প্রদেশের রুদ্রপুরে, রাজস্থানের কোটা জেলায়, দিল্লীর মোদীনগরের কাছে গোবিন্দপুরে, বিহারের বেতিয়ায় এবং মহিশুর অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যে এবং সর্ব্বোপরি রয়েছে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা। এসমস্ত জায়গাতেও আবার এখনই পুনর্ব্বাসন মিলবে না। প্রথমতঃ ক্যাম্প ক'রে একের পর এক এসব স্থানে এদের রাখা হবে—পরে যেমন যেমন জমির বন্দোবস্ত হবে তেমন এদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে।

পরিকল্পনার এখানেই শেষ নয়। সরকারী ক্যাম্পে থাকেন, এমন যে সব উদ্বাস্তু আছেন, তাদের সম্পর্কেও যাতে প্রতিশ্রুতির দায় এড়ানো যায় তারও কসুর কম করা হয় নি। এদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, এই সমস্ত উদ্বাস্তুরা, যারা সরকার নির্দ্দেশিত পুনর্ব্বাসন কেন্দ্রে যাননি বা যেতে অস্বীকার ক'রবেন—তাদের দায়িত্ব সরকার নেবেন না। এই শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের মধ্যে অধিকাংশই কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের মুসলিম পরিত্যক্ত বস্তী বা বাড়ী কিংবা সরকারী ব্যারাকের জবর দখলকারী; এঁদের অধিকাংশই কোন না কোন ভাবে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী সহরতলী অঞ্চলগুলিতে জীবিকার সংস্থান ক'রছেন। এদের দাবী জীবিকার সাথে সঙ্গতি রেখে পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা হোক কিন্তু এদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থীয় জীবিকার সংস্থান থেকে উৎপাটিত ক'রে পুনর্ব্বাসন ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হয়—ফলে অনেক ক্ষেত্রে তারা সরকার নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রগুলি গ্রহন করেন না। দার্জ্জিলিং সম্মেলনের এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে সরকার এই উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব এড়াবার অপচেষ্টা ক'রছেন।

বাংলার বাইরে উদ্বাস্তু প্রেরণ সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য এই যে, যেহেতু বর্ত্তমানে অধিকাংশ কৃষিজীবি এবং পশ্চিম বাংলায় আর চাষোপযোগী জমি নেই, তাই আরও উদ্বাস্তুদের এখানে রাখলে—ঘনবসতিপূর্ণ পশ্চিম বাংলার অর্থনীতি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়বে। পশ্চিমবঙ্গে জমি না থাকলেও এখানেই উদ্বাস্তুদের দেওয়া হোক – এমন অন্যায় আবদার আমরা ক'রবনা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—পশ্চিম বাংলায় চাষোপযোগী জমি নাই—একথা কি সত্যি?

অবিভক্ত বঙ্গে ১৯৪৪-৪৫ সালে পতিত জমির হিসাব সংগ্রহের জন্য মিঃ এইচ, এস্, ইসাক আই, সি, এসকে নিয়োগ করা হয় তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে। থানা ভিত্তিতে তিনি যে হিসাব সংগ্রহ করেন, তার পূর্ব্ববঙ্গের অংশ বাদ দিলে বর্ত্তমান পশ্চিম বাংলার অনাবাদী আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ একরের মত। এর শতকরা কতভাগ জমি উদ্বাস্তু কিংবা ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ ভূমি সংস্কার বিলের ফলে ৭৫ বিঘার অতিরিক্ত যে জমি বাধ্যতামূলক ভাবে সরকারের খাসে আসার কথা—তারই বা কত বিঘা জমি সরকার দখল নিয়েছেন এবং উদ্বাস্তু কিংবা স্থানীয় ভূমিহীন চাষীর মধ্যে বিলি করেছেন? এসমস্ত বিষয়েই সরকার নীরব—অথচ তারস্বরে চিৎকার সুরু হয়েছে যে পশ্চিম বাংলায় জমি নেই। আসল কথা এ সমস্ত জমিতে যদি হাত দিতে হয় তবে অনেক বড় বড় রাঘব বোয়াল জড়িয়ে পড়বেন। সুতরাং উদ্বাস্তুরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হোক, ভূমিহীন চাষীরা চিরকাল পরের জমিতে মজুরী খেটে

(৫ম পাতায় দেখুন)

কৃষ্ণা গ্লাস মজদুর ইউনিয়ন

আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের জয় লাভ

(সংবাদ দাতা)

গত ৮ই ডিসেম্বর কৃষ্ণা সিলিকেট এ্যাণ্ড্ গ্লাস ওয়ার্কস মজদুর ইউনিয়নের আহ্বানে ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্ব্বহাল ও দাবী সমূহের সমর্থনে এক সুসংগঠিত মিছিল সমস্ত যাদবপুর অঞ্চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই মিছিলকে বানচাল করার জন্য কোম্পানী নানাভাবে চেষ্টা করে কিন্তু তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে মালিকপক্ষ আংশিক পিছু হটেছে এবং শ্রমিকদের কোন কোন দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

দৈনিক ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম এবং অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য দ্বিগুণ হারে "ওভারটাইম" এর অধিকার ইতি পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্যকরী করেছে। "ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট" অনুসারে যে সমস্ত অধিকার শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা—তা থেকে এতদিন শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হচ্ছিল কিন্তু আন্দোলনের চাপে পড়ে তার অনেকগুলি অধিকার আজ কর্ত্তৃপক্ষ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ইউনিয়নের অন্যতম দাবী প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এই মাস থেকে কার্য্যকরী ভাবে চালু করা হয়েছে এবং "লিভ বুক" এর দাবী মেনে নিয়ে কারখানার ম্যানেজার এক পত্রে জানিয়েছেন যে কিছু দিনের মধ্যেই "লিভ বুক" চালু করা হবে।

ইউনিয়নের আন্দোলন এবং এই আংশিক জয়ের জন্য শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে এবং সংবাদে প্রকাশ যে মালিক সৃষ্ট "কর্ম্মী সংঘের" কার্য্যকরী সমিতি থেকে যুগ্ম সম্পাদক সহ ১১ জন সদস্য সংঘ থেকে পদত্যাগ ক'রে "মজদুর ইউনিয়নে"র সদস্য হয়েছেন। এই সদস্যগণ তাঁদের পদত্যাগ পত্রে অভিযোগ করেছেন "কর্ম্মী সংঘ" অধিকাংশ সদস্যদের কোন মতামত না নিয়ে গুটি কয়েক লোকের খেয়াল খুসীমত সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে মালিক পক্ষের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। এঁদের মতে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া বা অন্যকোন কল্যাণমূলক কাজ "কর্ম্মী সংঘ" এর মারফৎ হওয়া সম্ভব নয়। তাই তাঁরা উক্ত সংঘ ত্যাগ করে "মজদুর ইউনিয়ন" এর সদস্য হয়ে একে শক্তিশালী করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এঁদের এই পদ ত্যাগের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আশুতোষ কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন

ডি, এস, ও'র সবকয়টি আসন লাভ

আশুতোষ কলেজ দিবাবিভাগের ছাত্র ইউনিয়নের নির্ব্বাচনে এ বৎসর ডি, এস, ও. একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন করিয়াছে। কার্য্যকরী সমিতির সব কয়টি আসনে ডি, এস, ও, প্রার্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্র ফেডারেশন, এস, এস. ও, প্রভৃতি ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে গঠিত "স্বতন্ত্র সংস্থার" তথাকথিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অতি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ছাত্রদের লইয়া আশুতোষ কলেজ (দিবাবিভাগ) ছাত্র ইউনিয়নের কার্য্যকরী পরিষদ গঠিত হইয়াছে :

অসিত ভট্টাচার্য্য-সাধারণ সম্পাদক

কল্যানাশীষ দাশগুপ্ত—সহ-সভাপতি

ব্রজানন্দ রায়—সহ-সম্পাদক

চিত্ত ভট্টাচার্য্য—সম্পাদক, সাংস্কৃতিক বিভাগ

প্রমথ পাল—,, ক্রীড়া বিভাগ

দিলীপ বসু—সহ সম্পাদক, ক্রীড়া বিভাগ

সুনীত মিত্র—সম্পাদক, বিতর্ক বিভাগ

তপন রায় চৌধুরী—সম্পাদক, পুওর ফাণ্ড বিভাগ

তপন বসু ঠাকুর—সম্পাদক, কমনরুম

সত্য পাল—সম্পাদক, প্রাচীরপত্র

৪এর পাতার পর

আধ পেটা খেয়ে থাকুক আপত্তি নেই কিন্তু এই কায়েমী স্বার্থবাদীদের টিকিটি ছোঁয়া চলবে না।

একটা প্রশ্ন এখানে আসতে পারে যে সরকার হঠাৎ তার নীতি পরিবর্ত্তন ক'রল কেন? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে উদ্বাস্তু এবং অন্যান্য সমস্ত মেহনতী মানুষকে গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখতে বলি যে এর পেছনের কারণটা কি। সরকার এবং কংগ্রেসী নেতারা প্রতিশ্রুতি যতই দিয়ে থাকুন না কেন—পুনর্ব্বাসনের অধিকার, কলোনীগুলির স্বীকৃতি এবং অন্যান্য দাবীগুলি উদ্বাস্তুদের প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে বহু সংগ্রামী গণ আন্দোলনও রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে। কিন্তু গত সাধারণ নির্ব্বাচনের পর দেশের সমস্ত আন্দোলন, জঙ্গী আন্দোলনের পরিবর্ত্তে সংস্কার বাদী পার্লামেন্টারী আবহাওয়ার খাতে বইতে সুরু করেছে। উদ্বাস্তুদের সংগঠন ও নেতৃত্ব মূলতঃ কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে এবং উপরোক্ত সংস্কার বাদী পার্লামেন্টারী রাজনীতি—আজকে তাদের রাজনীতি। ফলে নেতারা পার্লামেন্ট আর এ্যাসেম্বলীতে গরম গরম বক্তৃতার ফুলঝুরি ছড়ান আর বাইরে সাধারণ উদ্বাস্তুদের সমস্ত বিক্ষোভকে অত্যন্ত সুকৌশলে ডেপুটেশন, মেমোরেণ্ডাম বড় জোর সীমাবদ্ধ সত্যাগ্রহের মধ্যে আটকে রাখেন। বেতিয়া প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের নিয়ে আন্দোলনের নামে যে 'কেলেঙ্কারী' করা হয়েছে—তা এই নীতিরই নবতম প্রকাশ। আজও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব থাকলে আন্দোলনের জন্য উদ্বাস্তুদের জমায়েৎ করা যায়—তার প্রমাণ "উদ্বাস্তু উচ্ছেদ (সংশোধনী) আইনের" বিরুদ্ধে বিধান সভা অভিযানের মধ্যে মিলবে কিন্তু এই সংস্কারবাদী রাজনীতি কোন ক্রমেই এই জমায়েৎকে জঙ্গী আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে দিতে চাইছেনা।

শোষক ও শাসক শ্রেণীও আজ এ সংবাদ রাখে। তারা জানে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব আজ আর ব্যাপক আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন না। তাই শান্তির ও অহিংসার মুখোস খুলে ফেলে দিয়ে এগিয়ে এসেছে কংগ্রেসী সরকার। তাই সংগঠিতভাবে কংগ্রেসী নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলনের—পথে এগিয়ে আসার জন্য উদ্বাস্তু ভাইদের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

কর্পোরেশনের ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি

অপূরিত দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য বিক্রমগড়ে নাগরিক সংস্থা গঠিত

গত ৬ই ডিসেম্বর বিক্রমগড় কলোনীর বিশিষ্ট অধিবাসী এবং এই অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় শ্রীসন্তোষ লাল দে'র আহ্বানে কর্পোরেশনের নানাবিধ সুযোগ সুবিধার দাবীতে এক প্রতিনিধি সভা বিক্রমগড় স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ দাস।

মূল প্রস্তাবে স্থানীয় সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটী কলিকাতা কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই সমগ্র এলাকার সাথে এই অঞ্চলের অধিবাসীরাও আশা করিয়াছিলেন যে কলিকাতা সহরের মত এই অঞ্চলও উন্নত হইবে কিন্তু গত ৪ বৎসরের অভিজ্ঞতায় জনসাধারণের এই আশা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। পানীয় জলের কোন সুষ্ঠু বন্দোবস্ত না থাকায় প্রতি বৎসর বহুলোক কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। রাস্তার কোন বন্দোবস্ত নাই। পূর্ব্বতন মিউনিসিপ্যাল রাস্তাগুলি সংস্কারের অভাবে চলাচলের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষায় জল জমিয়া বিভিন্ন পাড়াগুলি এক একটি দ্বীপের আকার ধারণ করে। বৈদ্যুতিক আলো বা অন্য কোন প্রকার আলোর বন্দোবস্ত না থাকায় চুরি রাহাজানী লাগিয়াই আছে। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত দাবীগুলি উপস্থিত করা হয়।—

(১) প্রতি দশটি পরিবার পিছু একটি নলকূপের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। (২) পুরাতন রাস্তাগুলির সংস্কার এবং নূতন প্রয়োজনীয় রাস্তা তৈরী করিতে হইবে। (৩) রাস্তাগুলিতে বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত করিতে হইবে (৪) বর্ত্তমান বাড়তি ট্যাক্স কমাইয়া পূর্ব্বতন হারে ট্যাক্স লইতে হইবে।

(৫) জবর দখল কলোনীগুলির অনুসন্ধান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ট্যাক্সের পরিমাণ পূর্ব্বেই জানাইয়া দিতে হইবে।

উপরোক্ত দাবীগুলি পরিপূরণের জন্য সুষ্ঠুভাবে আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে শ্রীসন্তোষলাল দেকে আহ্বায়ক করিয়া মোট পাঁচজন সদস্যকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হয়।

বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থায় "সশস্ত্র বিপ্লব" পুঁজিবাদী দেশমাত্রেই অপরিহার্য্য

(৩-এর পৃষ্ঠার পর)

বলিয়া মার্ক্সবাদের মৌলিক নীতি গুলির অস্বীকৃতি সম্পূর্ণ রূপে অবৈজ্ঞানিক। তাই আলোচ্য ঘোষণার উপরোক্ত শিক্ষাকে আমরা অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া মনে করি।

তবে এখানেই আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়া যাইতেছে না। আমরা উপরোক্ত শিক্ষাগুলিকে যেমন মূল্যবান বলিয়া মনে করি এবং সেজন্য তাঁহাদের (১২টি কম্যুনিষ্ট পার্টিকে) অভিনন্দন জানাই তেমনই আর একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। গভীর পর্য্যালোচনা করার পর আমাদের এ কথা মনে হইয়াছে যে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের বিবৃতির চেয়ে আলোচ্য বিবৃতি অনেকখানি উন্নত তবে তা আমাদের মতে সম্পূর্ণরূপে দুর্ব্বলতা মুক্ত নয়। বিবৃতির নিম্নোক্ত অংশ হইতে সে কথা প্রমাণ হইবে। এই ঘোষণায় এক জায়গায় বলা হইয়াছে "আজকে কতকগুলি পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকদলের নেতৃত্বের অধীনে শ্রমিক শ্রেণীর সহিত অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সংগঠন তথা ব্যাপক জনসাধারণের ঐক্যের উপর ভিত্তি করিয়া গৃহযুদ্ধ এড়াইয়া গিয়াই মূল উৎপাদন যন্ত্রগুলিকে জনসাধারণের হাতে হস্তান্তরিত করা সম্ভব। .....বেশীর ভাগ জনসাধারণের উপর নির্ভর করিয়া..... পার্লামেন্টে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া, পার্লামেন্টকে শোষক শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহৃত করার পরিবর্ত্তে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করা.....এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন সম্ভব।"

বিবৃতিতে বর্তমান অবস্থায় কোন্ কোন্ পুঁজিবাদী দেশে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব—তার কোন প্রকার উল্লেখ নাই। এছাড়া মার্ক্সবাদ সর্বদেশে সর্বকালে অবশ্যম্ভাবীরূপে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে নাকি কোন কোন বিশেষ অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ কারণ বিদ্যমান থাকিলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতাকেও স্বীকার করে—এই সাধারণতত্ত্ব আলোচনা অপেক্ষা বর্তমানে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ, জঙ্গী সমরবাদ ও আমলাতন্ত্র কোন্ অবস্থায় বিরাজ করিতেছে তার সঠিক বিশ্লেষণের উপর বর্তমান অবস্থায় বিপ্লবের সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল স্থির করা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কমরেড লেনিন যে সমস্ত অবস্থা বিরাজ করিলে সশস্ত্র বিপ্লব অপরিহার্য্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন যথা সাম্রাজ্যবাদ, একচেটে পুঁজিবাদ, সমরবাদ ও আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকিলে প্রতিরোধ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সেই অবস্থায় সশস্ত্র বিপ্লবের যে অবশ্য প্রয়োজনীয়তাকে ঘোষণা করিয়াছিলেন—আমরা মনে করি আজ সেই সমস্ত অবস্থাই বিশেষ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান এবং সেই কারণে সশস্ত্র বিপ্লবের তত্ত্বের সার্ব্বজনীন প্রয়োগ ক্ষমতা (validity) পুঁজিবাদী দেশ মাত্রেই আজও বর্তমান। (এস, ইউ, সির অন্যান্য পুস্তিকা দ্রষ্টব্য) এ ব্যাপারে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে ঘোষিত নীতি "প্রতিটি দেশের বিপ্লবের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট ছাড়াও কিছু কিছু পার্থক্যও বিদ্যমান। সেই অর্থে প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব অগ্রগতির বিশেষ পথ রহিয়াছে, কিন্তু মার্কসবাদী মতাদর্শের মৌলিক দিক হইতে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব মানব সমাজের এক বিশেষ স্তরে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত বিপ্লবের একটি সাধারণ নিয়মকেই (law) প্রতিভাত করে। এটা শুধু সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিকদেরই প্রশস্ত পথ নয়—এটা দুনিয়ার সমস্ত দেশের শ্রমিক শ্রেণীর প্রশস্ত পথ এবং এ পথেই তাদের বিজয় লাভ সম্ভব"—এ বিবৃতির সাথে আমরা সম্পূর্ণ একমত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোন্ কোন্ পুঁজিবাদী দেশের ক্ষেত্রে তাদের এই বক্তব্য, তার কোন উল্লেখ না থাকায় এবং বর্তমান দুনিয়ার বাস্তব অবস্থার সহিত বিপ্লবের প্রযোজ্য কর্মপন্থার যোগাযোগ না ঘটাইবার ফলে প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির সামনে এ কথা চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া হইল যে তার দেশেই বুঝি উপরোক্ত ঘোষিত বক্তব্য প্রযোজ্য। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, যে সংশোধনবাদকে ধূলিসাৎ করার জন্য এত গুরুত্ব আরোপ করা হইল সেই সংশোধনবাদ এই উপরোক্ত দুর্ব্বলতার আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার চেষ্টা করিবে। ফলে সংশোধনবাদকে দূর করার কাজ অবশ্যই ব্যাহত হইবে। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির যে সুর আমরা পাইতেছি এবং তাঁহারা যেভাবে এই বিবৃতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিতেছেন তাহা হইতে আমরা উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে বাধ্য হইয়াছি। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির ক্ষেত্রেও যে এ বিপদ রহিয়া গেল না একথা আজই নিঃসংশয়ে বলা চলে না।

বিবৃতির আর একটি অংশ "যদি শোষকশ্রেণী বলপ্রয়োগ করে তাহা হইলে কিন্তু অশান্তিপূর্ণ উপায় (non-peaceful transition to Socialism) সমাজতন্ত্রে পৌঁছাইবার কথা মনে রাখিতে হইবে"—আলোচনা করা দরকার। তত্ত্বগত দিক হইতে একথা সর্ব্বসময়ের জন্য সাধারণ সূত্র হিসাবেই প্রযোজ্য কিন্তু বর্তমানের বাস্তব অবস্থার ব্যাখ্যা না করিয়া এই কথাটুকু বলায়—সমস্যার গোড়ায় ঘা দেওয়া সম্ভব হইবে না। যেমন আমরা ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কাছ হইতে শুনিতে পাইতেছি যে "আমরা তো সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না, তবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লবের চেষ্টা করিতে গিয়া যদি শোষক শ্রেণীর কাছ হইতে প্রতিরোধের সম্মুখীন হই তখন আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পা দিব।" ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি বারোটি কম্যুনিষ্ট পার্টির বিবৃতির শেষোক্ত (উপরে দেখুন) উদ্ধৃতিটিকে তাদের এই বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োগ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু এই ধরণের আংশিক ব্যাখ্যার গলদ কোথায়? মনে রাখা দরকার যে কোন পুঁজিবাদী দেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লব সাধন সম্ভব—কি না একথা পরীক্ষার নাম করিয়া গণ-আন্দোলন ও গণ সংগঠণের ক্ষেত্রে যে কায়দা অনুসরণ করা হইতেছে এই পরীক্ষা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইলে সেই ধরণের সংগঠণ, চেতনা ও মানসিক গঠণ লইয়া সশস্ত্র বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সশস্ত্র বিপ্লব শুধু সেই মুহূর্ত্তের ব্যাপার নয় এর জন্য পূর্ব্ব হইতেই বিপ্লবী সংগঠণ, বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এক কথায় বিপ্লবের ব্যাপক প্রস্তুতি দরকার। পার্লামেন্টারী আন্দোলনের ব্যাপক নড়বড়ে সংগঠণের উপর দাঁড়াইয়া সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠণ অসম্ভব। ক্ষমতা দখলের অস্ত্র (Instrument for Seizure of power) ছাড়া অর্থাৎ তার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর দলের যোগ্য নেতৃত্বে ও বিপ্লবী গণসংগঠণ ব্যতিরেকে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ব করার কথা চিন্তা করা সম্পূর্ণরূপে অবৈজ্ঞানিক। এই কারণেই আলোচ্য বিবৃতির

(৭-এর পাতায় দেখুন)

বিজ্ঞপ্তি

বিরোধী দলের নেতার বেতন সম্পর্কে "যুগান্তর" ও "স্বাধীনতায়" যে বাদানুবাদ সৃষ্টি হইয়াছিল সে সম্পর্কে বহু চিঠি-পত্র আমাদের অফিসে আসিয়াছে। কিন্তু নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বোধে তাহা প্রকাশ করা হইল না।

—সঃ গঃ

রাষ্ট্রভাষা নির্দ্ধারণ সমস্যা প্রসঙ্গে বারোটি কম্যুনিষ্ট পার্টির যুক্ত বিবৃতি

(৮ম পাতার শেষাংশ)

সৃষ্টি হয় নি। কোন ভাষাকে হেয় করে দেখার মনোবৃত্তি থেকে নয়—তার বাস্তব অবস্থার যথাযথ স্বীকৃতি থেকে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান ছাড়া উপায় নেই। আমরা যারা একথা মনে করি যে গণমুক্তির পথকে বাধামুক্ত করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংস সাধন প্রয়োজন, যাঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সমাজের উন্নতি সাধনে অগ্রণী হয়েছেন তাঁদের কাছে নতুন চিন্তা, নতুন সংস্কৃতি প্রবর্ত্তনের জন্য সাংস্কৃতিক জগতের বিপ্লব সাধনের প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী। সেদিক থেকে বিচার করলে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও ক্ষতিকারক একথা মেনে নিতেই হবে। গোটা দেশের সংস্কৃতির মানকে উন্নত করতে হলে এবং জনসাধারণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে, বিশ্ব সংস্কৃতির সাথে পরিচিতির প্রশ্নে হিন্দীভাষার প্রবর্ত্তনকে যে কোন মূল্যে প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আজ যাঁরা জনতার অধিকতর সচেতনতার কথা শুনলে শঙ্কিত হন, যাঁরা চান, পুঁজিবাদ চিরস্থায়ী হোক এবং অজ্ঞ জনতা তাদের শোষণের খোরাক জোগাক তারা হিন্দী ভাষার প্রবর্ত্তনকে অতি সহজে মেনে নিয়েছেন। এবং বামপন্থীদের মধ্যে যারা (বিশেষ করে কম্যুনিষ্ট পার্টি) পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবকে অস্বীকার করেছেন এবং যে কোন উপায়ে জনতার ভোট আদায় ক'রে আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন করাকে মোক্ষ লাভের উপায় হিসাবে বিবেচনা করছেন তাদের সামনেও কিন্তু আজ আর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। বরং জনতা যতদিন অন্ধভাবে তাদের সত্যিকারের (?) কম্যুনিষ্ট জ্ঞানে ভোট দেয় ততই শ্রেয়। তাই সংস্কৃতি জগতের এই আসন্ন সঙ্কট অতি সহজেই তাদের দৃষ্টি এড়াতে সক্ষম হয়েছে।

আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করার মত। আজ কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থাতে শোষকগোষ্ঠীর প্রধান শক্তি তাদের ভাষা হিন্দী বলেই অন্যান্য উন্নত ভাষাকে চেপে দিয়ে হিন্দীর মত একটা অনুন্নত ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র চলেছে। Northern Bourgeoisiee ভাষা হিসাবেই হিন্দীকে জোর করে প্রবর্ত্তন করা ভাষার ক্ষেত্রে 'হিন্দী সাম্রাজ্যবাদে'র প্রবর্ত্তন হতে চলেছে একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না। এ বক্তব্য হিন্দী ভাষাভাষী শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে—হিন্দী ভাষাভাষী সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের বিরুদ্ধে নয়। হিন্দী ভাষাভাষী জনসাধারণকেও বুঝতে হবে যে প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে হিন্দী তাদের শিখতেই হবে। কিন্তু এছাড়াও দুনিয়ার অগ্রগতির তথা বিশ্ব সংস্কৃতির সাথে পরিচিত বা যুক্ত হতে হলে তাদের অপর একটি ভাষা শেখা প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে ইংরেজী ভাষা। তাই সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য, তথা দেশজোড়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং গণমুক্তির বৈজ্ঞানিক পথকে প্রশস্ত করার দিক থেকেই ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হিন্দী ভাষাভাষী জনসাধারণেরও কর্ত্তব্য। উগ্র জাতীয়তা বা সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা আমাদের মুক্তির পথকে প্রশস্ত করতে পারে না—একথা বুঝে নেবার প্রয়োজন রয়েছে। তাই আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে কোন বিশেষ ভারতীয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, সেই উদ্দেশ্যে কিছুদিন ইংরেজী চলুক—এ সিদ্ধান্ত নয়—ইংরেজীকেই রাষ্ট্রভাষার স্থান দিতে হবে, যদি না কোন ভারতীয় ভাষার এমন সমৃদ্ধি ঘটে যার মান ইংরেজীর চেয়ে কোন দিক থেকেই নীচু নয়; একমাত্র সেই অবস্থাতেই যদি বিশেষ কোন উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে ইংরেজীর পরিবর্ত্তে সেই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্থান দেওয়া চলতে পারে—নতুবা ইংরেজীকেই মেনে নেওয়া সবচাইতে যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব। আমরা দেশের প্রতিটি চিন্তাশীল কর্মী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে বিষয়টিকে গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি এবং আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক জগতের সামনে যে বিরাট সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে তাকে সর্বপ্রযত্নে রুখে দাঁড়াবার আবেদন জানাচ্ছি।

(৬-এর পাতার শেষাংশ)

এই দুর্ব্বলতা নির্দ্দেশ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি।

এই অংশ এবং আরোও কয়েকটি অংশ পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছে যে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি তার বিংশতিতম কংগ্রেসের বিবৃতি হইতে কিছু কিছু স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ভুল ত্রুটি গুলির প্রকাশ্য স্বীকৃতি তাহারা করেন নাই, বরং যেন পূর্ব্বের বক্তব্যের সাথে একটা adjustment or compromise করার চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন জাতীয় বৈশিষ্টের প্রতি বেশী জোর দিলে যে সংশোধনবাদ শক্তি সঞ্চয় করে এই কথা স্বীকার করিয়াই আবার পরমুহূর্ত্তে জাতীয় বৈশিষ্টের প্রতি নজর না দিলে কি কি বিপত্তি হইতে পারে তার অপ্রয়োজনীয় ফিরিস্তি গাহিয়াছেন। এই ধরণের কিছু কিছু দুর্ব্বলতা আমাদের চোখে পড়িলেও যতটুকু উন্নতি ঘটিয়াছে তার প্রতি আমরা বেশী জোর দিতে চাই। প্রতিটি সত্যিকারের কম্যুনিষ্টের কাছে সেটা মস্তবড় ও মূল্যবান শিক্ষা। সেই শিক্ষাগুলিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা ও তার সঠিক প্রয়োগ মারফৎ নিজ নিজ দেশে বিপ্লবকে সফল করার পথে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বকে শক্তিশালী করাই প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিক দলগুলির প্রধান কাজ। এস, ইউ, সি সেই শিক্ষাকে শিরোধার্য্য করিয়া ভারতের মাটিতে বিপ্লবের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য শোষিত জনতার সাহায্য কামনা করিতেছে।

নিবর্ত্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি

কংগ্রেসী স্বৈরাচারী নীতি অব্যাহত

গত ১০ই নভেম্বর "নিবর্ত্তন মূলক আটক আইন"টিকে পুনরায় তিন বৎসরের জন্য মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আইনটির নূতন কোন পরিচয় দেওয়া পাঠকদের কাছে নিতান্তই অনাবশ্যক। যে কোন লোককে (বাস্তব ক্ষেত্রে বিরোধী বামপন্থী দলগুলির কর্মীদের) কোন কারন না দেখাইয়া বিনা বিচারে যতদিন খুসী গ্রেপ্তার করিয়া রাখার অধিকারই এই আইনটির মূল বক্তব্য। শুধু যে দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আইনটি এখন করানো হইয়াছে তাহাই নহে—এই আইনের স্বপক্ষে বর্ত্তৃতা দিতে গিয়া বড় ছুদে কংগ্রেসী নেতারা যে ধরণের বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা যে কোন গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষকে শঙ্কিত করিয়া তুলিবে। নেহরুজী, পন্থজী তো আছেনই তার পরেও তাদের পদানুসরণকারী আইন সচিব অশোক সেন নেহেরুর নিকট শিক্ষা নবিসী শেষ করিয়া যে জঘন্য বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাদের উপরোক্ত মন্তব্যের নজীর পাওয়া যায়। শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সংবিধানকে রক্ষা করার দায়িত্ব নাকি লইয়াছেন এই সব ছোট বড় কংগ্রেসী নেতারা। তাঁরা তাঁদের দায়িত্বে চলুন—কিন্তু জনসাধারণ যদি তাহাদের দায়িত্ব না বোঝেন, যদি তাহারা সচেতন ভাবে এই সব ফ্যসিষ্টমূলক আইন প্রতিরোধ করিতে না আসেন তাহা হইলে দেশের দুর্দ্দিন দীর্ঘস্থায়ী হইবে সন্দেহ নাই।

হিন্দী ভাষার প্রবর্ত্তন সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও বিপ্লবী আন্দোলনকে বিপন্ন করতে সাহায্য করবে

(১-এর পাতার পর)

ঐতিহ্যের ধুয়া তুলে এর বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ হচ্ছে সঙ্কীর্ণ উগ্র জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং যুক্তি বিজ্ঞান বিরোধী পঙ্কে নিমজ্জিত হওয়া।

আজ যে সমস্ত বড় বড় কংগ্রেসী নেতা অপ্রয়োজনে, জনস্বার্থের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র নিছক সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার তাগিদে ভারতবর্ষকে বিদেশী শোষণের জালে আবদ্ধ করে রাখছে, যারা আজও কমনওয়েলথের ঘৃণ্য দাসত্বের বন্ধনে দেশকে আটকে রেখেছে, যারা বহু ক্ষেত্রেই ইঙ্গমার্কিণ জোটের সাথে নিজেদের ভাগ্যকে জড়িয়ে রাখতে কসুর করছেনা, তাদের মুখ থেকে এই রাষ্ট্রভাষা স্থির করার ক্ষেত্রে "জাতীয় সার্ব্বভৌমত্ব" সম্পর্কে লম্বা চওড়া বক্তৃতা সত্যই হাস্যকর। বোঝা দরকার যে ইংরেজী শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করা আর ইংরেজী ভাষার বিরুদ্ধে লড়াই করা এক কথা নয়। একথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুললে চলবে না যে, ইংরেজ শাসনের এক বিশেষ স্তরে এদেশে যে জাতীয়তাবোধ ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল এবং যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন ইংরেজ শাসনকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সেই নব জাগ্রত জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠার পেছনে ইংরেজী ভাষার এক বাস্তব অবদান ছিল। ইংরেজ শোষণের ফলে ভারতবাসীর তীব্র দুঃখ, কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল এবং ভারতের নিজস্ব অগ্রগতির পথ ব্যাহত হয়েছিল সত্য, কিন্তু ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ভারতবাসী দুনিয়ার তদানীন্তন প্রগতিশীল তথা জাতীয়তার চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়—এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যে ভাষা সেদিন জাতীয় ঐক্য বোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল তা হচ্ছে—ইংরেজী। সুতরাং একথা কোন দিক থেকেই স্বীকার করা যায় না যে ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রবর্ত্তন করলে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব (ধনিক শ্রেণীর অর্থেও) খর্বিত হবে।

দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে যে বেশীর ভাগ লোকের ভাষা হিন্দী তাই তাকে গ্রহণ করতে হবে। এ কথাও এক অর্থে সম্পূর্ণরূপে অসত্য। ১৯৫৩ সালের হিসাব থেকে পাওয়া যায় যে ৩৬ কোটী লোকের মধ্যে মাত্র ১২ কোটী লোকের মাতৃভাষা হচ্ছে হিন্দী। তাছাড়া রাষ্ট্রভাষা স্থির করার ক্ষেত্রে কত বেশী লোক সে ভাষায় কথা বলে এটা কোন সমর্থনযোগ্য মাপকাঠি হতে পারে না। ১২ কোটী লোক হয়তো অন্য কোন একটি ভাষায় কথা বলে না সত্য—কিন্তু বাকী ২৪ কোটী লোককে তো নূতন ভাষাই শিখতে হচ্ছে। তাই বিষয়টি সমস্ত দিক থেকে বিচার না করলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে হিন্দীভাষার উন্নতির প্রশ্ন। আমরা মনে করি যে কোন ভাষার উন্নতির প্রশ্নের সাথে সেই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা না করার প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই। এই দুটি বিষয় এক ও অভিন্ন নয়। যদি কোন ভাষার সাধারণ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির প্রশ্ন আসে (এবং ভারতীয় প্রতিটি ভাষার অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির যে প্রশ্ন সকলেই মুখে স্বীকার করেছেন) তাহলে সেই কাজ সম্পাদনের একটি মাত্র উপযুক্ত পথ খোলা আছে। আমরা মনে করি যে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রাদেশিক বা উপজাতীয় ভাষার (nationality language) অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন এই সব প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে প্রদেশগত প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষার বাহন (medium of instruction) হিসাবে মেনে নেওয়া, কোর্ট-কাচারী আইন আদালতের ক্ষেত্রেও এই নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষায় কাজ চালানো এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে প্রতিটি ভাষার অগ্রগতির জন্যই সরকারী তদারক একান্ত প্রয়োজন। তার জন্য নিয়মিত গবেষণা এবং প্রতিটি ভাষার নিজ নিজ বৈশিষ্টের প্রতি যথার্থ নজর রাখা অত্যাবশ্যক। সুতরাং এইভাবে যার যার প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষা-দীক্ষা সমস্ত কিছুর যথাযথ ব্যবস্থা হলে জনসাধারণের পক্ষে তা যথেষ্ট হিতকর হবে সন্দেহ নেই। তবে একথাও ঠিক যে প্রতিটি প্রদেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য ভাষাভাষী জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থাও তাদের নিজ নিজ ভাষায় সম্পন্ন করার সুযোগ দিতে হবে।

এই ভাবেই প্রতিটি ভারতীয় ভাষার অগ্রগতির পথকে উন্মুক্ত করা সম্ভব। কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থেকেই গেল, যে বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য কোন্ ভাষাকে স্থির করা হবে বা এক কথায় কোন্ ভাষাকে আমরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করবো? পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে হিন্দী ভাষার অগ্রগতির জন্য তাকে রাষ্ট্রভাষা করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিলেই তার উন্নতি অব্যাহতই থাকবে। তবে দেখা যাচ্ছে যে হিন্দীকে যদি রাষ্ট্রভাষা করা যায় তাহলে একমাত্র হিন্দী ভাষাভাষী জনসাধারণ ছাড়া আর সকলকেই যার যার মাতৃভাষা ছাড়াও আর একটি দ্বিতীয় ভাষা শিখতে হবে। আর যদি ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করা হয় তাহলে সকলকে একটি দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজী) শিখতে হবে। সুতরাং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যার যার মাতৃভাষা ছাড়া একটি দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। আর এ রকম একটি দ্বিতীয় ভাষা যদি শিখতেই হয় তাহলে এমন ভাষা শেখাই কি যুক্তিযুক্ত বা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, যে ভাষা উন্নত ও যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী, যে ভাষা দুনিয়ার জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে পরিচিত, যে ভাষায় বিশ্ব সংস্কৃতির নিখুত ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব এবং যে ভাষা যে কোন কারনেই হোক ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট পরিচিত? শুধু তাই নয়, যে ভাষা ভারতবাসীর এক অংশের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে তাকে কোন্ যুক্তির দ্বারা হটিয়ে দেবার চেষ্টা চলেছে আমরা বুঝতে অক্ষম। আমাদের দৃঢ় অভিমত যে এ সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করার বহু কিছু রয়ে গেছে—এটা নেহাৎ একটা মামুলী বা গতানুগতিক সমস্যা নয়। এ বিষয়টিকে আর একটু তলিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

একটু চিন্তা করলেই একটা কথা বোঝা কষ্টকর হবে না যে মানুষ চিন্তা করে কোন না কোন ভাষার মাধ্যমে। ভাষা হীন কোন চিন্তা হয় না। মানুষ হাওয়ায় বা vaccum এ চিন্তা করতে পারে না। তাই মানুষের চিন্তার অগ্রগতির সাথে সাথে ভাষাও একই তালে সমৃদ্ধশালী হয়েছে। সুতরাং যে ভাষা যতবেশী সম্পদশীল সে ভাষায় ততবেশী উন্নত ও জটিল চিন্তা প্রকাশ করা সম্ভব। পক্ষান্তরে যে ভাষা বেশী পশ্চাদপদ সে ভাষায় কোন উচ্চ বা জটিল বিষয় চিন্তা করা অসম্ভব। কোন দেশের সংস্কৃতির মান যতটা সে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল সেটা বাদ দিলে বাকীটা সেই দেশের ভাষা কত উন্নত তার দ্বারা অনেকাংশে নির্ণীত হয়। ইংরেজী ভাষার সংস্পর্শে এসে বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির যে স্তরের সাথে ভারতবাসীর যোগাযোগ ঘটেছে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রবর্ত্তন করলে তা থেকে ভারতবাসী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তাই হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করলে শুধু যে একটা পিছিয়ে-পড়া ভাষার চর্চ্চা করতে হবে তাই নয়, এই ভাষা চর্চ্চার মাধ্যমে ক্রমশঃ আমাদের সংস্কৃতির মান উন্নত হওয়ার পরিবর্ত্তে পিছিয়েই পড়বে। একটি দৈনিক পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছে যে, যেমন গরুর গাড়ী দিয়ে স্পুটনিককে ধরা যায় না—তেমনি হিন্দী ভাষার সাহায্যে আজকের দিনের অগ্রগমন্ত বিশ্ব সংস্কৃতিকে স্পর্শ করা সম্ভব হবে না। প্রকৃতপক্ষে একথা কারও অজানা নয় যে হিন্দীতে আজও কোন উচুদরের সাহিত্যও

(৭ম পাতায় দেখুন)

-- প্রীতিশচন্দ্র কর্ত্তৃক ২৩নং ডিক্সন লেন পরিবেশক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত